গীতার ভূমিকা

আশ্বিন, ১৩২৭

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস

চন্দননগর

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডিতলা
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
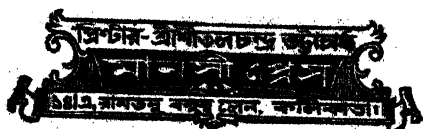
বিজ্ঞাপন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসর আলিপুর জেলে বাস করিবার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ভারতে সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে যে নব-দীক্ষা লাভ করেন, তাহার প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া 'কর্ম্মযোগিন্' (ইংরাজী) ও 'ধর্ম্ম' (বাঙ্গালা) নামে দুই-খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বেদের লুপ্ত গূঢ় অর্থ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে যে তপস্যা করিতে হইবে, এই দুইখানি পত্রিকাতেই তিনি তাহার পূর্ব্বাভাষ ইঙ্গিতে জানাইয়া-ছিলেন। সেই সময়ে বেদের সত্যধর্ম্মে আলোকিত হইয়া গীতার যে নূতন ব্যাখ্যা তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে, তাহার কথঞ্চিৎ সাধারণকে জানাইবার জন্য তিনি 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে গীতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তারপর সাধনার উপযোগী ক্ষেত্র মনোনয়ন করিয়া নির্জ্জনে তপস্যা করিবার আদেশ আসায় তাঁহাকে বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। সেইজন্য গীতা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। আমরা উপস্থিত তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ গীতা প্রকাশ করিতেছি।

তাঁহার এই অসম্পূর্ণ গীতা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিতে চাহি। কথায় আছে, 'নানা মুনির

নানা মত'। পাণ্ডিত্য হিসাবে গীতার নূতন ব্যাখ্যার কোন আবশ্যকতাই নাই—কত বড় বড় পণ্ডিত নানাদিক হইতে ষড়দর্শনের সাহায্যে যুক্তিতর্ক সহায়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার ফলে গীতাকে আশ্রয় করিয়া ষড়দর্শনের ভাবগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা পাঠে আমাদের বুদ্ধি যে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, বিচার শক্তি যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে জাতির জীবন ধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রাখিয়া যে প্রত্যক্ষানুভূতি, তাহার কোনই নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই না।

সনাতন ধর্ম্ম এক, কিন্তু যুগে যুগে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; সেই মূর্ত্তিগুলি ঠিক ভাবে দেখিতে পাওয়া এবং ধারাবাহিকরূপে তাহাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই যুগোপযোগী মূর্ত্তিটিকে যুগধর্ম্ম নামক বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করিতে সক্ষম হওয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞানী প্রত্যাদিষ্ট সাধকেই সম্ভব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীঅরবিন্দের গীতাতে পাঠক সেই ভাবটি দেখিতে পাইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ গীতা-সিন্ধুকের চাবিকাটিটি আমাদের হাতে দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা সেই চাবিকাটিটি দেশবাসীর হস্তে দিতেছি। ইহাতেই আমাদের সার্থকতা।

প্রকাশক

১লা আশ্বিন, ১৩২৭

চন্দননগর।

সূচীপত্র

প্রথম কল্প :—

দ্বিতীয় কল্প:—

তৃতীয় কল্প :—

———

গীতার ভূমিকা

প্রস্তাবনা

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্ম্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্ম্মপন্থা উন্নতি-মুখী জগতের সনাতন মার্গ।

গীতা অমূত রত্নপ্রসূ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল পাওয়া যায় না। শত বৎসর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই অনন্ত রত্নভাণ্ডারের সহস্রাংশ ধনও আহরণ করা দুষ্কর। অথচ দুএকটী রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলে দরিদ্র ধনী হন, গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবদ্বিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপরাক্রমী শক্তিমান

গীতার ভূমিকা

কর্ম্মবীর তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ও সন্নদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্য বংশধরগণ সর্ব্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।

এইরূপ গভীর ও গুপ্তজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক অথচ ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, রচনা সরল, বাহ্যিক অর্থ সহজবোধগম্য। গীতাসমুদ্রের অনুচ্চ তরঙ্গের উপরে উপরে বেড়াইলে এবং ডুব না দিলেও কতক শক্তি ও আনন্দবৃদ্ধি হয়। গীতারূপ আকরের রত্নোদ্দীপিত গভীর গুহায় প্রবেশ না করিয়া চারিপার্শ্বে বেড়াইলেও তৃণের মধ্যে পতিত উজ্জ্বল মণি পাওয়া যায়, ইহজীবনের তরে তাহাই লইয়া ধনী সাজিতে পারিব।

গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগৎশ্রেষ্ঠ মহা-পণ্ডিত বা গভীর জ্ঞানী গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে আর গীতার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল। সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া এই জ্ঞানের কয়েকদিক মাত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব, বহুকাল যোগমগ্ন হইয়া বা নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরূঢ় হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিব যে গীতোক্ত কয়েকটী গভীর সত্য উপলব্ধি করিলাম বা গীতার দুএকটী শিক্ষা ইহজীবনে কার্য্যে পরিণত করিলাম। লেখক যেটুকু

উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কর্ম্মপথে অভ্যাস করিয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক দ্বারা তদনুযায়ী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অপরের সাহায্যার্থ বিবৃত করা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

বক্তা

গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে বক্তা, পাত্র ও তখনকার অবস্থার কথা বিচার করা প্রয়োজন। বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাঁহার সখা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, অবস্থা কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

অনেকে বলেন, মহাভারত রূপক মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জ্জুন জীব, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রিপু সকল, পাণ্ডবসেনা মুক্তির অনুকূল বৃত্তি। ইহাতে যেমন মহাভারতকে কাব্য জগতে হীন স্থান দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা কর্ম্মীর জীবনে উপযোগিতা ও উচ্চ মানবজাতির উন্নতিকারক শিক্ষা খর্ব্ব ও নষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার মূল কারণ এবং গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কাল্পনিক অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, গীতার ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, সংসারে আচরণীয় ধর্ম্ম না হইয়া সংসারের অনুপযোগী শান্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। শাস্ত্রে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চতুর্থ

অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতিবাদ অবলম্বন করিয়া ভগবান সর্ব্বভূতের দেহে প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত, বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতকপরিমাণে ব্যক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণদেহে পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র রূপকমাত্র, সেই রূপক বর্জ্জন করিয়া গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু সেই শিক্ষার এই অংশ বাদ দিতে পারি না। অবতারবাদ যদি থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারক।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মনুষ্যের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। সেই লীলার প্রকাশ্য ও গূঢ় শিক্ষা যদি আয়ত্ত করিতে পারি, এই জগদ্ব্যাপী লীলার অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিব। এই মহতী লীলার প্রধান অঙ্গ পূর্ণজ্ঞানপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের মধ্যে ও সেই লীলার মূলে কি জ্ঞান নিহিত ছিল, গীতায় তাহা প্রকাশিত হইল।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার জীবনে মহাশক্তির অতুলনীয় বিকাশ ও রহস্যময় ক্রীড়া দেখি। সেই রহস্যের ব্যাখ্যা গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপ্রভু, বিশ্বব্যাপী বাসুদেব, অথচ স্বীয় মহিমা প্রচ্ছন্ন করিয়া পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, সখা, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি

সম্বন্ধ মানবদিগের সঙ্গে স্থাপন করিয়া লীলা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রহস্য এবং ভক্তিমার্গের উত্তম শিক্ষা নিহিত আছে। ইহার তত্ত্বগুলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কল্পে কল্পে সেই সন্ধিস্থলে ভগবান পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগ চতুর্যুগের মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগ মানবোন্নতির প্রধান শত্রু পাপপ্রবর্ত্তক কলির রাজ্যকাল, মানবের অত্যন্ত অবনতি ও অধোগতি কলির রাজ্যকালে হয়। কিন্তু বাধার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শক্তিবৃদ্ধি হয়, পুরাতনের ধ্বংসে নূতনের সৃষ্টি হয়, কলিযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। জগতের ক্রমবিকাশে অশুভের যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই কলিযুগে অতিবিকাশে নষ্ট হয়, এক দিকে নূতনের বীজ বপিত ও অঙ্কুরিত হয়, সেই বীজই সত্যযুগে বৃক্ষে পরিণত হয়। উপরন্তু যেমন জ্যোতিষ বিদ্যায় একটী গ্রহের দশায় সকল গ্রহের অন্তর্দ্দশা ভোগ হয়, তেমনই কলির দশায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নিজ নিজ অন্তর্দ্দশা বারবার ভোগ করে। এইরূপ চক্রগতিতে কলিযুগে ঘোর অবনতি, আবার উন্নতি, আবার ঘোরতর অবনতি, আবার উন্নতি হইয়া ভগবানের অভিসন্ধি সাধিত হয়। দ্বাপর কলির সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুভের অতিবিকাশ, অশুভের নাশ, শুভের বীজবপন ও অঙ্কুরপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা করিয়া যান, তাহার পরে কলির আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার মধ্যে সত্যযুগানয়নের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রণালী রাখিয়া

গিয়াছেন। কলির সত্য অন্তর্দ্দশার আগমনকালে গীতাধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সেই সময় উপস্থিত বলিয়া গীতার আদর কয়েকজন জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণে এবং ম্লেচ্ছদেশেও প্রসারিত হইতেছে।

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারূপ বাক্য স্বতন্ত্র করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি।

পাত্র

গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন। যেমন বক্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, তেমনই পাত্রকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, এক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ তাঁহারা মানবদেহধারী পুরুষোত্তমের সহিত স্ব স্ব অধিকার ও পূর্ব্বকর্ম্মভেদানুসারে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাঁহার অনুগত সহচর ও অনুচর, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্ত্রণাচালিত আত্মীয় ও বন্ধু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের ন্যায় কেহই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমবয়স্ক পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে সেই সকল মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার প্রিয়তম সখা,

তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভগ্নী সুভদ্রার স্বামী। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এই ঘনিষ্ঠতা অর্জ্জুনকে গীতার পরমরহস্য শ্রবণের পাত্র রূপে বরণ করিবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

"এই পুরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমার ভক্ত সখা বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। কারণ, এই যোগ জগতের শ্রেষ্ঠ ও পরম রহস্য।" অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্রস্বরূপ কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র ব্যক্ত করিবার সময় এই কথার পুনরুক্তি হইয়াছে।

সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

"আবার আমার পরম ও সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেষ্ঠ পথের কথা প্রকাশ করিব।" এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য শ্রুতির অনুকূল, যেমন কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥

"এই পরমাত্মা দার্শনিকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধা-শক্তি দ্বারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহারই লভ্য, তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় শরীর প্রকাশ করেন।" অতএব যিনি ভগবানের সহিত সখ্য ইত্যাদি মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।

ইহার মধ্যে আর এক অতি প্রয়োজনীয় কথা নিহিত। ভগবান অর্জ্জুনকে এক শরীরে ভক্ত ও সখা বলিয়া বরণ করিলেন। ভক্ত নানাবিধ; সাধারণতঃ কাহাকেও ভক্ত বলিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই ভক্তির মূলে প্রেম আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বাধ্যতা, সম্মান ও অন্ধভক্তি তাহার বিশেষ লক্ষণ। সখা কিন্তু সখাকে সম্মান করেন না; তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক আমোদ ও স্নেহ-সম্ভাষণ করেন; ক্রীড়ার্থ তাঁহাকে উপহাস ও তাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করেন। সখা সর্ব্বকালে সখার বাধ্য হয়েন না, তাঁহার জ্ঞান-গরিমা ও অকপট হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া যদিও তাঁহার উপ-দেশানুসারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে; তাঁহার সহিত তর্ক করেন; সন্দেহ সকল জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতের প্রতিবাদও করেন। ভয়বিসর্জ্জন সখ্য সম্বন্ধের প্রথম শিক্ষা, সম্মানের বাহ্য আড়ম্বর বিসর্জ্জন তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা; প্রেম তাহার প্রথম কথা ও শেষ কথা। যিনি এই জগৎসংসারকে মাধুর্য্যময়, রহস্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় ক্রীড়া বুঝিয়া ভগবানকে ক্রীড়ার

সহচর রূপে বরণ করিয়া সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র। যিনি ভগবানের মহিমা, প্রভুত্ব, জ্ঞান-গরিমা, ভীষণত্বও হৃদয়ঙ্গম করেন, অথচ অভিভূত না হইয়া তাঁহার সহিত নির্ভয়ে ও হাসিমুখে খেলা করিয়া থাকেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।

সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে আর সকল সম্বন্ধ অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি মধুর হয়, এইরূপ সম্বন্ধই অর্জ্জুন গীতার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থাপন করিলেন। "তুমি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, তোমা-ভিন্ন কাহার শরণাপন্ন হইব ; আমি হতবুদ্ধি, কর্ত্তব্য-ভয়ে ভীত, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তীব্রশোকে অভিভূত। তুমি আমাকে রক্ষা কর, উপদেশ দান কর, আমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সমস্ত ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।" এই ভাবে অর্জ্জুন মানবজাতির সখা ও সহায়ের নিকট জ্ঞানলাভার্থ আসিয়া-ছিলেন। আবার মাতৃসম্বন্ধ এবং বাৎসল্য ভাবও সখ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, কনীয়ান ও অল্পবিত্ত সখাকে মাতৃবৎ ভালবাসেন, রক্ষা করেন, যত্ন করেন, সর্ব্বদা কোলে রাখিয়া বিপদ ও অশুভ হইতে পরিত্রাণ করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য স্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট স্বীয় মাতৃরূপও প্রকাশ করেন। সখ্যের মধ্যে যেমন মাতৃপ্রেমের গভীরতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমের তীব্রতা ও উৎকট আনন্দও আসিতে পারে। সখা সখার সান্নিধ্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন, তাঁহার বিরহে

কাতর হয়েন; তাঁহার দেহস্পর্শে পুলকিত হয়েন, তাঁহার জন্ম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে আনন্দভোগ করেন। দাস্য সম্বন্ধও সখ্যের ক্রীড়ার অন্তর্ভূক্ত হইলে অতি মধুর হয়। বলা হইয়াছে, যিনি যত মধুর সম্বন্ধ পুরুষোত্তমের সহিত স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহার সখ্যভাব তত প্রস্ফুটিত হয় এবং তত গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্রত্ব লাভ হয়।

কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন মহাভারতের প্রধান কর্ম্মী, গীতায় কর্ম্মযোগ-শিক্ষা প্রধান শিক্ষা। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিন মার্গ পরস্পর বিরোধী নহে, কর্ম্মমার্গে জ্ঞান-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে ভক্তিলব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে তাঁহারই সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই আদিষ্ট কর্ম্ম করা গীতোক্ত শিক্ষা। যাঁহারা সংসারের দুঃখে ভীত, বৈরাগ্য-পীড়িত, ভগবানের লীলায় জাতবিতৃষ্ণ, লীলা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে লুক্কাইয়া থাকিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের মার্গ স্বতন্ত্র। বীরশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের সেইরূপ কোনও ইচ্ছা বা ভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত সন্ন্যাসী বা দার্শনিক জ্ঞানীর নিকট এই উত্তম রহস্য প্রকাশ করেন নাই, কোন অহিংসা-পরায়ণ ব্রাহ্মণকে এই শিক্ষার পাত্র বলিয়া বরণ করেন নাই, মহা-পরাক্রমী তেজস্বী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা এই অতুলনীয় জ্ঞানলাভের উপ-যুক্ত আধার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিলেন। যিনি সংসার-যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে অবিচলিত, তিনিই এই শিক্ষার গূঢ়তম স্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। যিনি মুমুক্ষুত্ব অপেক্ষা ভগবান-লাভের আকাঙ্খা পোষণ করেন, তিনিই ভগবৎ-

সান্নিধ্যের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান বলিয়া উপলব্ধি করিতে এবং মুমুক্ষুত্ব অজ্ঞানের শেষ আশ্রয় বুঝিয়া বর্জ্জন করিতে সমর্থ। যিনি তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক অহঙ্কারেও বদ্ধ থাকিতে চাহেন না, তিনিই গুণাতীত হইতে সমর্থ। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে রাজসিক বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, অথচ সাত্ত্বিক আদর্শ গ্রহণে রজঃশক্তিকে সত্ত্বমুখী করিয়াছেন। সেইরূপ পাত্র গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম আধার।

অর্জ্জুন সমসাময়িক মহাপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সেই যুগের সর্ব্ববিধ সাংসারিক জ্ঞানে পিতামহ ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতৃষ্ণায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর শ্রেষ্ঠ, সাধুতায় সাত্ত্বিক গুণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে উদ্ধব ও অক্রূর শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্য্যে ও পরাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথ কর্ণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জ্জুনকেই জগৎপ্রভু বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে অচলা জয়শ্রী এবং গাণ্ডীব প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারা ভারতের সহস্র সহস্র জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা নিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন সাম্রাজ্য অর্জ্জুনের পরাক্রমলব্ধ দানরূপে সংস্থাপন করিলেন; উপরন্তু তাঁহাকেই গীতোক্ত পরম জ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ণীত করিলেন। অর্জ্জুনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কর্ম্মী, সেই কাব্যের প্রত্যেক অংশ তাঁহারই যশোকীর্ত্তি ঘোষণা করে। ইহা পুরুষোত্তম বা মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নহে। এই উৎকর্ষ

সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি পুরুষোত্তমের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নির্ভরপূর্ব্বক কোনও দাবী না করিয়া স্বীয় শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, পাপ ও পুণ্যের সমস্ত ভার তাঁহাকে সমর্পণ করেন, নিজ প্রিয়কর্ম্মে আসক্ত না হইয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া তৎপ্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংসিত গুণ সাগ্রহে আলিঙ্গন না করিয়া তদ্দত্ত গুণ ও প্রেরণা তাঁহারই কার্য্যে প্রযুক্ত করেন; সেই শ্রদ্ধাবান অহঙ্কার-রহিত কর্ম্মযোগী পুরুষোত্তমের প্রিয়তম সখা ও শক্তির উত্তম আধার, তাঁহা দ্বারা জগতের বিরাট কার্য্য নির্দ্দোষ-রূপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা মহম্মদ এইরূপ যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্জ্জুনও সেইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সেই চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ। যিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃঢ় চেষ্টা করেন, তিনিই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও সখা হইয়া তাঁহার ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

অবস্থা

মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য ও উক্তির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে কি অবস্থায় সেই কার্য্য বা সেই উক্তি কৃত বা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে যখন শস্ত্রপ্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে,—প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে—সেই

সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে বিস্মিত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নিশ্চয় কবির অসাবধানতা বা বুদ্ধির দোষ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইরূপ ভাবাপন্ন পাত্রকে দেশকালপাত্র বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।

সময় যুদ্ধের প্রারম্ভকাল। যাঁহারা প্রবল কর্ম্মস্রোতে নিজ বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কখনও গীতোক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। উপরন্তু যাঁহারা কোন কঠিন মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, যে মহাব্রতে অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক শত্রুবৃদ্ধি, অনেক পরাজয়ের আশঙ্কা স্বভাবতঃই হয়, সেই মহাব্রতের আচরণে যখন দিব্যশক্তি জন্মিয়াছে, তখন ব্রতের শেষ উদ্‌যাপনার্থে, ভগবানের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ এই জ্ঞান প্রকাশ হয়। গীতা কর্ম্মযোগে ভগবানলাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্ম্মেতেই জ্ঞান জন্মায়, অতএব গীতোক্ত মার্গের পথিক পথত্যাগ করিয়া দূরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্ব্বতে বা নির্জ্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্যপথেই কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল, যেখানে শস্ত্রপাত হইতেছে। যাঁহারা এই পথে পথিক, এইরূপ কর্ম্মে অগ্রণী, প্রায়ই কোনও গুরুতর ফলোৎপাদক সময়ে, যখন কর্ম্মীর কর্ম্মানুসারে অদৃষ্টের গতি এদিক না ওদিক চালিত হইবে, তখনই অকস্মাৎ তাঁহাদের

যোগসিদ্ধি ও পরম জ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার জ্ঞান কর্ম্মরোধক নয়, কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাও সত্য যে ধ্যানে, নির্জ্জনে, স্বস্থ আত্মার মধ্যে জ্ঞানোন্মীলন হয়, সেইজন্য মনীষিগণ নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগের পথিক মনপ্রাণ-দেহরূপ আধার এমন ভাবে বিভক্ত করিতে পারেন, যে, তিনি জনতায় নির্জ্জনতা, কোলাহলে শান্তি, ঘোরকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরম নিবৃত্তি অনুভব করেন। তিনি অন্তরকে বাহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়ন পূর্ব্বক যোগাশ্রমের শরণ লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন। সংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম। সাধারণ যোগী বাহ্যিক শান্তি ও নীরবতা অভিলাষ করেন, শান্তিভঙ্গে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। কর্ম্মযোগী অন্তরে বিশাল শান্তি ও নীরবতা ভোগ করেন, বাহ্যিক কোলাহলে সেই অবস্থা আরও গভীর হয়, বাহ্যিক তপোভঙ্গে সেই স্থির আন্তরিক তপঃ ভগ্ন হয় না, অবিচলিত থাকে। লোকে বলে, সমরোদ্যত সৈন্যের মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদ কিরূপে সম্ভব হয়। উত্তর, যোগপ্রভাবে সম্ভব হয়। সেই যোগবলে যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্তরে ও বাহিরে শান্তি বিরাজ করে, যুদ্ধের কোলাহল সেই দুইজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাতে কর্ম্মোপযোগী আর এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত। যাঁহারা গীতোক্ত যোগ অনুশীলন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী অথচ কর্ম্মে অনাসক্ত। কর্ম্মের মধ্যেই আত্মার আন্তরিক আহ্বান শ্রবণে

তাঁহারা কর্ম্মে বিরত হইয়া যোগমগ্ন ও তপস্যারত হন। তাঁহারা জানেন কর্ম্ম ভগবানের, ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র, অতএব কর্ম্মফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে কর্ম্মযোগের সুবিধার জন্য, কর্ম্মের উন্নতির জন্য, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেই আহ্বান হয়। অতএব কর্ম্মে বিরত হইতে ভয় করেন না, জানেন যে তপস্যায় কখন বৃথা সময়ক্ষেপ হইতে পারে না।

পাত্রের ভাব, কর্ম্মযোগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেককর। বিশ্বসমস্যা, সুখদুঃখ সমস্যা, পাপপুণ্য সমস্যায় বিব্রত হইয়া অনেকে পলায়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় বুঝাইয়া নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। যীশু, টলষ্টয় ইত্যাদি মানবজাতির সন্ততিস্থাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগতের চিরন্তন নিয়ম যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। সন্ন্যাসী বলেন, কর্ম্মই অজ্ঞানসৃষ্ট, অজ্ঞান বর্জ্জন কর, কর্ম্ম বর্জ্জন কর, শান্ত নিষ্ক্রিয় হও। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মে বিলীন হও। তবে এই জগৎ কেন, এই সংসার কেন? ভগবান যদি থাকেন, কেন অর্ব্বাচীন বালকের ন্যায় এই বৃথা পণ্ডশ্রম, এই নীরস উপহাস আরম্ভ করিয়াছেন? আত্মাই যদি থাকে, জগৎ মায়াই হয়, এই আত্মাই বা কেন এই জঘন্য স্বপ্ন নিজ নির্ম্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ করিয়াছেন? নাস্তিক বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। তাহাই বা কিরূপ কথা? শক্তি কাহার? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, কেনই বা অন্ধ ও উন্মত্ত? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক

মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই, না খ্রীষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞানিক; সকলেই এই বিষয়ে নিরুত্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। এক উপনিষদ্ ও তাহার অনুকূল গীতা এইরূপ ফাঁকি দিতে অনিচ্ছুক। সেই-জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হইয়াছে। ঘোর সাংসারিক কর্ম্ম, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, আত্মীয়হত্যা তাহার উদ্দেশ্য, সেই অযুত প্রাণী-সংহারক যুদ্ধের প্রারম্ভ, অর্জ্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গাণ্ডীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, কাতরস্বরে বলিতেছেন :—

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

"কেন আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?" উত্তরে সেই যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে ভগবৎ-মুখ-নিঃসৃত মহাগীতি উঠিয়াছে।

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং।

* * *

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

* * *

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥

* * *

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

*　　*　　*

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

*　　*　　*

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

*　　*　　*

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

*　　*　　*

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

*　　*　　*

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা।
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥

*　　*　　*

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

"অতএব তুমি কর্ম্মই করিয়া থাক, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তোমাকেও সেই কর্ম্ম করিতে হইবে।......যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম কর।......যাহার বুদ্ধি যোগস্থ, তিনি পাপ পুণ্য এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রেই অতিক্রম করেন, অতএব যোগার্থ সাধনা কর, যোগই

শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধন।......মানুষ যদি অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন, তিনি নিশ্চয় পরম ভগবানকে লাভ করিবেন।......জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ে আমার উপর তোমার সকল কর্ম্ম নিক্ষেপ কর, কামনা পরিত্যাগে, অহঙ্কার পরিত্যাগে দুঃখরহিত হইয়া যুদ্ধে লাগ।......যিনি মুক্ত, আসক্তিরহিত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা জ্ঞানে নিবাস করে, যিনি যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করেন, তাঁহার সকল কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া তখনই আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়।......সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেই হেতু তাহারা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া মোহে পতিত হয়।......আমাকে সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সখা ও বন্ধু বলিয়া জানিলে পরম শান্তিলাভ হয়।......আমিই তোমার শত্রুগণকে বধ করিয়াছি, তুমি যন্ত্র হইয়া তাহাদের সংহার কর, দুঃখিত হইও না, যুদ্ধে লাগিয়া যাও, বিপক্ষকে রণে জয় করিবে।...যাঁহার অন্তঃকরণ অহংজ্ঞানশূন্য, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহার করেন, তথাপি তিনি হত্যা করেন নাই, তাঁহার পাপরূপ কোন বন্ধন হয় না।"

প্রশ্ন এড়াইবার, ফাঁকি দিবার কোন লক্ষণ নাই। প্রশ্নটী পরিষ্কার ভাবে উত্থাপন করা হইল। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধর্ম্মপথ কি, গীতায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। অথচ সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্ম্মশিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। ইহাতেই গীতার সার্ব্বজনীন উপযোগিতা।

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন

হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥

সঞ্জয় বলিলেন

তখন রাজা দুর্য্যোধন রচিতব্যূহ পাণ্ডব-অনীকিনী দেখিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

"দেখুন আচার্য্য, আপনার মেধাবী শিষ্য দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা রচিতব্যূহ এই মহতী পাণ্ডবসেনা দেখুন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

এই বিরাট সৈন্যে ভীম ও অর্জ্জুনের সমান মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষ আছেন,—যুযুধান, বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ,

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও মহাপ্রতাপী কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরপুঙ্গব শৈব্য,

বিক্রমশালী যুধামন্যু ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, যাঁহারা আমার সৈন্যের নেতা, তাঁহাদের নাম আপনার স্মরণার্থ বলিতেছি, লক্ষ্য করুন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ ও সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ,

এবং অন্য অনেক বীরপুরুষ আমার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

আমাদের এই সৈন্যবল একে অপরিমিত, তাহাতে ভীষ্ম আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাদের ওই সৈন্যবল পরিমিত, ভীমই তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আশাস্থল।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি ॥ ১১ ॥

অতএব আপনারা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সৈন্য ভাগে অবস্থান করিয়া সকলে ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।"

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

দুর্য্যোধনের প্রাণে হর্ষোদ্রেক করিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদে রণস্থল ধ্বনিত করিয়া মহাপ্রতাপভরে শঙ্খনিনাদ করিলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য অকস্মাৎ বাদিত হইল, রণস্থল উচ্চ-শব্দসঙ্কুল হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান মাধব ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫॥

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য ধনঞ্জয় দেবদত্ত ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুল সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত যোদ্ধা সাত্যকি,

দ্রুপদ, দৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারিদিক হইতে স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥

সেই মহাশব্দ আকাশ ও পৃথিবী তুমুল রবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০॥

তখন শস্ত্র নিক্ষেপ আরব্ধ হইবার পরে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্রণসমুদ্যমে॥ ২২॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধেপ্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন

"হে নিষ্পাপ, দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর,
ততক্ষণ যুদ্ধস্পৃহায় অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করি।
জানিতে চাই, কাহাদের সহিত এই রণোৎসবে যুদ্ধ করিতে হইবে।
দেখি এই যুদ্ধপ্রার্থীগণ কাহারা, যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য করিবার কামনায় এইখানে সমাগত হইয়াছেন।"

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন

গুড়াকেশের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে
সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন পূর্ব্বক
ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমুদায় নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।"

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২৬॥

সেই রণস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ, যত আত্মীয় ও স্বজন, দুই পরস্পরবিরোধী সৈন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭॥

সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ অবস্থিত দেখিয়া কুন্তীপুত্র তীব্র কৃপায় আবিষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯॥

অর্জ্জুন বলিলেন

"হে কৃষ্ণ, এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমার দেহের অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে,

সমস্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত, গাণ্ডীব অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, চর্ম্ম যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥

আমি দাঁড়াইবার শক্তিরহিত হইলাম, মন যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে কেশব, অশুভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহিনা।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥ ৩৩॥

বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি লাভ ভোগে? কি প্রয়োজন জীবনে? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয়,
তাঁহারাই জীবন ও ধন ত্যাগ করিয়া এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত,
—আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ,

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, কুটুম্ব। হে মধুসূদন, ইঁহারা যদি আমাকে বধ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বধ করিতে চাই না, ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা। ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিয়া, হে জনার্দ্দন! আমাদের কি মনের সুখ হইতে পারে?

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ করিলে পাপই আমাদের মনে আশ্রয় পাইবে। অতএব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যখন আমাদের আত্মীয়, তখন তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আমরা অধিকারী নহি। হে মাধব, স্বজনবধে আমরা কিরূপে সুখী হইব?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয় কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

যদিও ইহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রের অনিষ্টকরণে মহাপাপ বুঝেন না,

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

আমরা, জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের জ্ঞান হইবে না, এই পাপ হইতে আমরা কেন নিবৃত্ত হইব না?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্মসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মনাশে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অধর্ম্মের অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হয়। কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাপ্তির হেতু, কেননা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃলোক হইতে পতিত হন।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোৎপাদক দোষ সকলের ফলে সনাতন জাতিধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩॥

যাঁহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, সেই মনুষ্যদের নিবাস নরকে নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪॥

ওহো! আমরা অতি মহৎ পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, যে, রাজ্যসুখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যম করিতেছিলাম।

যদি মাম প্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫॥

যদি অশস্ত্র ও প্রতিকারে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন

এই বলিয়া অর্জ্জুন শোকোদ্বেগে কলুষিতচিত্ত হইয়া যুদ্ধকালে আরূঢ়শর ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে বসিয়া পড়িলেন।

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি

গীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে উক্ত হয়। অতএব গীতার প্রথম শ্লোকে দেখি রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেষ্টা কি, বৃদ্ধ রাজা তাহা জানিতে উৎসুক। সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তির কথা আধুনিক ভারতের ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বলিতাম অমুকলোক দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ও দূর শ্রবণ (Clairaudience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য ও মহারথীগণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটী তত অবিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারিত। আর ব্যাসদেব যে এই শক্তি সঞ্জয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আরও আষাঢ়ে গল্প বলিয়া উড়াইতে প্রবৃত্তি হয়। যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ অমুক লোককে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotism এর কথা

মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন। অথচ hypnotism যোগশক্তির নিকৃষ্ট ও বর্জ্জনীয় অঙ্গ মাত্র। মানুষের মধ্যে এমন অনেক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে পূর্ব্বকালের সভ্যজাতি সেই সকল জানিত ও বিকাশ করিত; কিন্তু কলি-সম্ভূত অজ্ঞানের স্রোতে সেই বিদ্যা ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল আংশিকরূপে অল্পলোকের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীয় জ্ঞান বলিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মদৃষ্টি বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আছে যাহা দ্বারা আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারি, সূক্ষ্মবস্তু দর্শন, সূক্ষ্ম শব্দ শ্রবণ, সূক্ষ্ম-গন্ধ আঘ্রাণ, সূক্ষ্ম পদার্থ স্পর্শ ও সূক্ষ্ম আহার আস্বাদ করিতে পারি। সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম পরিণামকে দিব্যচক্ষু বলে, তাহার প্রভাবে দূরস্থ, গুপ্ত বা অন্য লোকগত বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য hypnotist এর অদ্ভুত শক্তিতে যদিও আমরা অবিশ্বাসী হই না, তবে অতুল্য জ্ঞানী ব্যাস-দেবের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইব কেন? শক্তিমানের শক্তি পরের শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ও মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন, ইতো প্রভৃতি কর্ম্মবীর উপযুক্ত পাত্রে শক্তি সংক্রামণ দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সহকারী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি সামান্য যোগীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কয়েক-

মুহূর্তের জন্য বা কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য পরকে স্বীয় সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন—ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও অসামান্য যোগসিদ্ধ পুরুষ। বাস্তবিক, দিব্যচক্ষুর অস্তিত্ব আষাঢ়ে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথা। আমরা জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, নাসিকা আঘ্রাণ করে না, ত্বক্ স্পর্শ উপলব্ধি করে না, রসনা আস্বাদ করে না, মনই দর্শন করে, মনই শ্রবণ করে, মনই আঘ্রাণ করে, মনই স্পর্শ উপলব্ধি করে, মনই আস্বাদ করে। দর্শন শাস্ত্রে ও মনস্তত্ত্ববিদ্যায় এই সত্য অনেকদিন হইতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, hypnotismএ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যে, চক্ষু মুদ্রিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য যে কোন নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে চক্ষু ইত্যাদি স্থূলেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রাপ্তির কেবল সুবিধাজনক উপায়, স্থূল শরীরের সনাতন অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের দাস হইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে কোন শারীরিক প্রণালী দ্বারা সেই জ্ঞান মনকে পৌঁছাইতে পারি—যেমন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদার্থের আকৃতির ও স্বভাবের নির্ভুল ধারণা করে। কিন্তু অন্ধের দৃষ্টি ও স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় যে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি মনের মধ্যে দেখে। ইহাকেই দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আমি সম্মুখস্থিত পুস্তক দর্শন করি না, সেই পুস্তকের যে প্রতিমূর্ত্তি আমার চক্ষুতে চিত্রিত হয় তাহাই দেখিয়া মন বলে, পুস্তক দেখিলাম। কিন্তু স্বপ্নাবস্থা-

প্রাপ্তের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও শ্রবণে ইহাও প্রতিপন্ন হয়, যে, পদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক প্রণালীর আবশ্যকতা নাই,—সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিতে পারি। লণ্ডনে ঘরে বসিয়া সে সময় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের মধ্যে তাহা দেখিলাম, এইরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও দিব্যচক্ষুতে এই প্রভেদ আছে যে, সূক্ষ্মদর্শী মনের মধ্যে অদৃষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে, দিব্যচক্ষু দ্বারা আমরা মনের মধ্যে সেই দৃশ্য না দেখিয়া, শারীরীক চক্ষের সম্মুখে দেখি, চিন্তাস্রোতে সেই শব্দ না শুনিয়া শারীরীক কর্ণে শুনি। ইহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত Crystalএ বা কালির মধ্যে সমসাময়িক ঘটনা দেখা। কিন্তু দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে এইরূপ উপকরণের কোন আবশ্যকতা নাই, তিনি এই শক্তি-বিকাশে বিনা উপকরণে দেশকালের বন্ধন খুলিয়া অন্য দেশের ও অন্য কালের ঘটনা অবগত হইতে পারেন। দেশবন্ধন মোচনের প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি, কালবন্ধনও যে মোচন করা যায়, মানুষ যে ত্রিকালদর্শী হইতে পারে, তাহার এত বহুসংখ্যক ও সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই। তবে যদি দেশবন্ধন মোচন করা সম্ভব হয়, কালবন্ধন মোচন অসম্ভব কথা বলা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিব্যচক্ষুদ্বারা সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমবেত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণকে চক্ষে দেখিলেন, দুর্য্যোধনের উক্তি, পিতামহ ভীষ্মের ভীম সিংহনাদ, পাঞ্চজন্যের

কুরুধ্বংসঘোষক মহাশব্দ ও গীতার্থদ্যোতক কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ কর্ণে শ্রবণ করিলেন।

আমাদের মতে মহাভারতও রূপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও কবির কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তার্কিক বা দার্শনিকের সিদ্ধান্ত নহে। অতএব গীতার কোনও কথা যে অসম্ভব বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এইজন্যই দিব্যচক্ষু-প্রাপ্তির কথা এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

দুর্য্যোধনের বাক্‌কৌশল

সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেষ্টা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য রচিত ব্যূহ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেন দ্রোণের নিকট গেলেন তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। ভীষ্মই সেনাপতি, যুদ্ধের কথা তাঁহাকেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু কূটবুদ্ধি দুর্য্যোধনের মনে ভীষ্মের উপর বিশ্বাস ছিল না। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনুরক্ত, হস্তিনাপুরের শান্ত্যনুমোদক দলের (peace party) নেতা; যদি পাণ্ডবে ধার্ত্তরাষ্ট্রেই যুদ্ধ হইত, ভীষ্ম কখনই অস্ত্রধারণ করিতেন না; কিন্তু কুরুদের প্রাচীন শত্রু ও সমকক্ষ সাম্রাজ্যলিপ্সু পাঞ্চালজাতি দ্বারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্—সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন

স্বয়ং অসুরপ্রকৃতি, রাগদ্বেষই তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের প্রমাণ ও হেতু, অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিবার বল এই কঠিন তপস্বীর প্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। স্বদেশহিতৈষী পরামর্শের সময়ে স্বীয় মত প্রকাশ পূর্ব্বক স্বজাতিকে অন্যায় ও অহিত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই অন্যায় ও অহিত একবার লোক দ্বারা স্বীকৃত হইলে স্বীয় মত উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মযুদ্ধেও স্বজাতি রক্ষা ও শত্রুদমন করেন, ভীষ্মও সেই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাবও দুর্য্যোধনের বোধাতীত। অতএব ভীষ্মের নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে স্মরণ করিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগত ভাবে পাঞ্চালরাজের ঘোর শত্রু, পাঞ্চাল দেশের রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণকে বধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ, অর্থাৎ দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এই ব্যক্তিগত বৈরভাবের কথা স্মরণ করাইলে আচার্য্য শান্তির পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিবেন। স্পষ্ট সেই কথা বলিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম মাত্র উল্লেখ করিলেন, তাহার পরে ভীষ্মকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে কুরুরাজ্যের রক্ষক ও বিজয়ের আশাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। প্রথম বিপক্ষের মুখ্য মুখ্য যোদ্ধার নাম উল্লেখ করিলেন, পরে স্বসৈন্যের কয়েকজন নেতার নাম বলিলেন, সকলের নহে, দ্রোণ ও ভীষ্মের নামই তাঁহার অভিসন্ধি-সিদ্ধ্যর্থে যথেষ্ট, তবে সেই অভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য আর চারি পাঁচটী নাম বলিলেন।

তাহার পরে বলিলেন, "আমার সৈন্য অতি বৃহৎ, ভীষ্ম আমার সেনাপতি, পাণ্ডবদের সৈন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের আশাস্থল ভীমের বাহুবল, অতএব আমাদের জয় হইবে না কেন ? তবে ভীষ্মই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাঁহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সকলের উচিত, তিনি থাকিলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।" অনেকে "অপর্য্যাপ্ত" শব্দের বিপরীত অর্থ করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, দুর্য্যোধনের সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সেই সৈন্যের নেতাগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে কাহারও ন্যূন নহেন, আত্মশ্লাঘী দুর্য্যোধন কেন স্ববলের নিন্দা করিয়া নিরাশা উৎপাদন করিতে যাইবেন ? ভীষ্ম দুর্য্যোধনের মনের ভাব ও গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার সন্দেহ অপনোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করি-লেন। দুর্য্যোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাদন হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, দ্রোণ ও ভীষ্ম দ্বিধা দূর করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

পূর্ব্ব সূচনা

যেই ভীষ্মের গগনভেদী শঙ্খনাদে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল, তখনই সেই বিশাল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং রণোল্লাসে রথীগণ মাতিতে লাগিল। অপর-দিকে পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের যুদ্ধাহ্বানের উত্তরস্বরূপ শঙ্খনাদ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি

পূর্ব্ব সূচনা

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্ডীকে সৈন্যের হৃদয়ে জাগাইলেন। সেই মহান শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে ধ্বনিত করিয়া যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ইহার এই অর্থ নহে যে ভীষ্ম প্রভৃতি এই শব্দে ভীত হইলেন, তাঁহারা বীরপুরুষ, রণচণ্ডীর আহ্বানে ভীত হইবেন কেন? এই উক্তিতে কবি প্রথম অত্যুৎকট শব্দের শারীরিক বেগবান সঞ্চার বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন বজ্রনাদ অনেকবার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া যায় এইরূপ শ্রোতার বোধ হয়, তেমনই এই রণক্ষেত্রব্যাপী মহাশব্দের সঞ্চার হইল; আর এই শব্দ যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভাবী নিধনের ঘোষণা; যে হৃদয়গুলি পাণ্ডবদের শস্ত্র বিদীর্ণ করিবেন, পূর্ব্বেই তাঁহাদের শঙ্খনাদ সেইগুলি বিদীর্ণ করিয়া গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই দিক হইতে শস্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, এই সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি,কে কে বিপক্ষ, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয় কর্ম্ম করিতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। অর্জ্জুনের ভাব এই যে আমিই পাণ্ডবদের আশাস্থল, আমাদ্বারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা হন্তব্য, অতএব দেখি ইহারা কাহারা। এই পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ভাব রহিয়াছে, কৃপা কিম্বা দৌর্ব্বল্যের কোন চিহ্ন নাই। ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বিপক্ষের সৈন্যে উপস্থিত, সকলকে সংহার করিয়া অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অসপত্ন সাম্রাজ্য দিবার জন্য উদ্যোগী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অর্জ্জুনের

মনে দৌর্ব্বল্য আছে, এখন চিত্ত পরিষ্কার না করিলে এমন কোনও সময়ে উহা অকস্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া অধিকার করিতে পারে যে পাণ্ডবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয় ত সর্ব্বনাশ হইবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে রথ স্থাপন করিলেন যে ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রিয়জন তাঁহার সম্মুখে রহিলেন অথচ আর সকল কৌরবপক্ষীয় নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ, সমবেত কুরুজাতিকে দেখ। স্মরণ করিতে হয় যে অর্জ্জুন স্বয়ং কুরুজাতীয়, কুরুবংশের গৌরব, তাঁহার সকল আত্মীয়, প্রিয়জন, বাল্যের সহচরগণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই তিনটী সামান্য কথার গভীর অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন অর্জ্জুন দেখিলেন যাঁহাদের সংহার করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহারা আর কেহ নন, নিজ প্রিয় আত্মীয়, গুরু, বন্ধু, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখিলেন সমস্ত ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ পরস্পরের সহিত প্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ অথচ পরস্পরকে সংহার করিতে এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আগত।

বিষাদের মূলকারণ

অর্জ্জুনের নির্ব্বেদের মূল কি? অনেকে এই বিষাদের প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুমার্গপ্রদর্শক ও অধর্ম্মের অনুমোদক বলিয়া নিন্দা করেন। খৃষ্টধর্ম্মের শান্তিভাব, বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাভাব এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমভাবই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাপ,

ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাতক, তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা দ্বাপর যুগের মহাবীর পাণ্ডবের মনেও উঠে নাই ; অহিংসাভাব শ্রেষ্ঠ বা যুদ্ধ, নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাপ বলিয়া যুদ্ধে নিরত হওয়া উচিত, এই চিন্তার কোনও চিহ্নও অর্জ্জুনের কথায় ব্যক্ত হয় না। বলিলেন বটে গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর, বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবের হত্যায় পাপ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, কিন্তু কর্ম্মের স্বভাব দেখিয়া এই কথা বলেন নাই, কর্ম্মের ফল দেখিয়া বলিলেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিষাদ ভঞ্জনার্থ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে কর্ম্মের ফল দেখিতে নাই, কর্ম্মের স্বভাব দেখিয়া সেই কর্ম্ম উচিত না অনুচিত স্থির করিতে হয়। অর্জ্জুনের প্রথম ভাব এই যে ইহারা আমার আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর, সকলে স্নেহ, ভক্তি ভালবাসার পাত্র, ইহাদের হত্যায় অসপত্ন রাজ্যলাভ করিলে সেই রাজ্যভোগ কদাচ সুখপ্রদ হইতে পারে না, বরং যাবজ্জীবন দুঃখ ও পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, বন্ধুবান্ধব-শূন্য পৃথিবীর রাজ্য কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। অর্জ্জুনের দ্বিতীয় ভাব এই যে প্রিয়জনকে হত্যা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, যাঁহারা দ্বেষের পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তৃতীয় ভাব—স্বার্থের জন্য এইরূপ কর্ম্ম করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত। চতুর্থ ভাব এই যে ভ্রাতৃবিরোধে ও ভ্রাতৃহত্যায় কুলনাশ ও জাতিধ্বংস গঠিবে, এইরূপ কুফল সৃষ্টি কুলরক্ষক ও জাতিরক্ষক ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে

মহাপাপ। এই চারিটী ভাব ভিন্ন অর্জ্জুনের বিষাদের মূলে আর কোনও ভাব নাই। ইহা না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অর্থও বুঝা যায় না। খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত গীতার ধর্ম্মের বিরোধ ও সামঞ্জস্যের কথা পরে বলা হইবে। অর্জ্জুনের কথার ভাব সূক্ষ্ম বিচারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রদর্শন করিব।

বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ

অর্জ্জুন প্রথম তাহার বিষাদের বর্ণনা করিলেন। স্নেহ ও কৃপার অকস্মাৎ বিদ্রোহে মহাবীর অর্জ্জুন অভিভূত ও পরাস্ত, তাহার শরীরের সমস্ত বল এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ সকল অবসন্ন, বেড়াইবার শক্তিও নাই, বলবানের হস্ত গাণ্ডীব ধারণে অসমর্থ, শোকের উত্তাপে জ্বরের লক্ষণ ব্যক্ত, শরীরের দৌর্ব্বল্য হইয়াছে, ত্বক যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখের ভিতর শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে ঘুরিতেছে। এই ভাবের বর্ণনা পড়িয়া প্রথম কবির তেজস্বিনী কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ বলিয়া কেবল সেই কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া ক্ষান্ত হই; কিন্তু যদি সূক্ষ্ম বিচারে নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটি গূঢ় অর্থ মনে উদয় হয়। অর্জ্জুন পূর্ব্বেও কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় নাই, এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আসুরিক উৎ-

পাত হইয়াছে। মনুষ্যজাতির অনেক অতিপ্রবল বৃত্তি ক্ষত্রিয় শিক্ষা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের হৃদয়তলে গুপ্তভাবে রহিয়াছে। নিগ্রহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সংযমে চিত্তশুদ্ধি হয়। নিগৃহীত বৃত্তি ও ভাব সকল হয় এই জন্মে, নহে পরজন্মে একদিন চিত্ত হইতে উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম স্ববিকাশের অনুকূল পথে চালায়। এই হেতু যে এই জন্মে দয়াবান, সে অন্য জন্মে নিষ্ঠুর হয়, যে এই জন্মে কামী ও দুশ্চরিত্র সে অন্য জন্মে সাধু ও পবিত্রচেতা হয়। নিগ্রহ না করিয়া বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে বৃত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া চিত্ত পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। জ্ঞানের প্রভাবে তমোভাবের অপনোদন না হইলে সংযম অসম্ভব। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অজ্ঞান দূর করিয়া সুপ্ত বিবেক জাগাইয়া চিত্ত শোধন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু পরিহার্য্য বৃত্তি সকল চিত্ত হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত না করিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর পায় না, উপরন্তু যুদ্ধেই অন্তঃস্থ দৈত্য ও রাক্ষস বিবেক বুদ্ধিকে মুক্ত করে। যোগের প্রথম অবস্থায় যত কুপ্রবৃত্তি চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, প্রবল বেগে বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া অনভ্যস্ত সাধককে ভীতি ও শোক বিহ্বল করিয়া ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য দেশে বলে শয়তানের প্রলোভন, ইহাই মারের আক্রমণ। কিন্তু সেই ভীতি ও শোক অজ্ঞানসম্ভূত, সেই প্রলোভন শয়তানের নহে, ভগবানের। অন্তর্যামী জগদ্‌গুরুই সেই সকল প্রবৃত্তি

সাধককে আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন, অমঙ্গলের জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, চিত্তশোধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশরীরে বাহ্যজগতে অর্জ্জুনের সখা ও সারথি, তেমনই তাঁহার মধ্যে অশরীরী ঈশ্বর ও অন্তর্যামী পুরুষোত্তম, তিনিই এই গুপ্ত বৃত্তি ও ভাব প্রবল বেগে এক সময়ে বুদ্ধির উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘূর্ণ্যমান হইল এবং প্রবল মানসিক বিকার তৎক্ষণাৎ স্থূল শরীরে কবিবর্ণিত লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক দুঃখের এইরূপ শারীরিক বিকাশ হয়, তাহা আমরা জানি, তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ অনুভবের বহির্ভূত নহে। অর্জ্জুনকে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া অখণ্ড বলে এক মুহূর্ত্তে অভিভূত করিল, সেই জন্য এই প্রবল বিকার। যখন অধর্ম্ম দয়া প্রেম ইত্যাদি কোমল ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া, অজ্ঞান জ্ঞানের বেশে ছদ্মবেশী হইয়া আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোগুণ উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতার ভাণ করিয়া বলে, আমি সাত্ত্বিক, আমি জ্ঞান, আমি ধর্ম্ম, আমি ভগবানের প্রিয় দূত, পুণ্যরূপী ও পুণ্যপ্রবর্ত্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ

এই বৈষ্ণবী মায়ার মুখ্য অস্ত্র কৃপা ও স্নেহ। মানবজাতির প্রেম ও ভালবাসা বিশুদ্ধ বৃত্তি নহে, শারীরিক ও প্রাণকোষগত

বিকারের বশে পবিত্র প্রেম ও দয়া কলুষিত ও বিকলাঙ্গ হয়। চিত্তই বৃত্তির বাসস্থান, প্রাণ ভোগের ক্ষেত্র, শরীর কর্ম্মের যন্ত্র, বুদ্ধি চিন্তার রাজ্য। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পরের অবিরোধী প্রবৃত্তি হয়, চিত্তে ভাব ওঠে, শরীর দ্বারা তদনুযায়ী কর্ম্ম হয়, বুদ্ধিতে তৎসম্পর্কীয় চিন্তা হয়, প্রাণ সেই ভাব, কর্ম্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ করে, জীব সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির এই আনন্দময় ক্রীড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে। অশুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ শারীরিক বা মানসিক ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া শরীরকে কর্ম্মযন্ত্র না করিয়া ভোগের উপায় করে, শরীর ভোগে আসক্ত হইয়া বার বার শারীরিক ভোগের জন্য দাবী করে, চিত্ত শারীরিক ভোগের কামনায় আক্রান্ত হইয়া আর নির্ম্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হয়, কলুষিত বাসনা-যুক্ত ভাব চিত্তসাগর বিক্ষুব্ধ করে, সেই বাসনার কোলাহল বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া খিব্রত করে, বধির করে, বুদ্ধি আর নির্ম্মল শান্ত অভ্রান্ত চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয় না, চঞ্চল মনের বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিন্তাবিভ্রাটে অনৃতের প্রাবল্যে অন্ধ হয়। জীবও এই বুদ্ধিভ্রংশে হৃতজ্ঞান হইয়া সাক্ষীভাব ও নির্ম্মল আনন্দভাবে বঞ্চিত হইয়া আধারের সহিত নিজ একত্ব স্বীকার করিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিত্ত, আমি বুদ্ধি, এই ভ্রান্ত ধারণায় শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হয়। অশুদ্ধ চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব চিত্তশুদ্ধি উন্নতির প্রথম সোপান। এই অশুদ্ধতা কেবল তামসিক ও রাজসিক

বৃত্তিকে কলুষিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সাত্ত্বিক বৃত্তিকেও কলুষিত করে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা মানসিক ভোগের সামগ্রী, আমার ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহার বিরহে আমার ক্লেশ হয়, ইহা অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ চিত্তকে কলুষিত করিয়া নির্ম্মল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে। বুদ্ধিও সেই অশুদ্ধতার ফলে ভ্রান্ত হইয়া বলে, অমুক আমার স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী, সখা, আত্মীয়, মিত্র, তাহাকেই ভাল বাসিতে হয়, সেই প্রেম পুণ্যময়, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্য্য যদি করি, তাহা পাপ, ক্রূরতা, অধর্ম্ম। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমের ফলে এমন বলবতী কৃপা হয় যে প্রিয়জনের কষ্ট, প্রিয়জনের অনিষ্ট অপেক্ষা ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়াও শ্রেয়স্কর বোধ হয়, শেষে এই কৃপার উপর আঘাত পড়ে বলিয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নিজ দৌর্ব্বল্যের সমর্থন করি। এইরূপ বৈষ্ণবীমায়ার প্রমাণ অর্জ্জুনের প্রত্যেক কথায় পাওয়া যায়।

এই ভাবের ক্ষুদ্রতা

অর্জ্জুনের প্রথম কথা, ইঁহারা আমাদের স্বজন, আত্মীয়, ভালবাসার পাত্র, তাহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদের কি হিত সাধিত হইবে? বিজেতার গর্ব্ব, রাজার গৌরব, ধনীর সুখ? আমি এইসকল শূন্য স্বার্থ চাই না। লোকের রাজ্য, ভোগ, জীবন প্রিয় হয় কেন? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছেন বলিয়া,

আত্মীয় স্বজনকে সুখে রাখিতে পারিব বলিয়া, বন্ধু বান্ধবের সহিত ঐশ্বর্য্যের সুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারিব বলিয়া এই সকল সুখ ও মহত্ত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও সুখ চাই, তাঁহারাই আমাদের শত্রু হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত। তাঁহারা আমাদিগকে বরং বধ করিতে প্রস্তুত তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য ও সুখ একত্র ভোগ করিতে সম্মত নন। আমাকে বধ করুন, আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন বধ করিতে পারিব না। যদি তাঁহাদের হত্যায় ত্রিলোক রাজ্য অধিকার করিতাম, তাহা হইলেও পারিতাম না, পৃথিবীর অসপত্ন সাম্রাজ্য কি ছার! স্থূলদর্শী লোক—

"ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"

এবং

"এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে॥"

এই উক্তিতে মোহিত হইয়া বলেন, "অহো! অর্জ্জুনের কি মহান উদার নিঃস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিরাক্ত ভোগ ও সুখ অপেক্ষা পরাজয়, মরণ, চিরদুঃখ তাঁহার বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু যদি অর্জ্জুনের মনের ভাব পরীক্ষা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে অর্জ্জুনের ভাব অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলতা-প্রকাশক, ক্লীবোচিত। কুলের হিতার্থে বা প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্য্যের পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে পারে,

আর্য্যের পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্বার্থত্যাগ করাই উত্তম ভাব। অপর পক্ষে কুলের হিতার্থে, প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অধম ভাব। ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্নেহ, কৃপা ও ভয় দমন করা প্রকৃত আর্য্যভাব। এই ক্ষুদ্রভাবের সমর্থনার্থ অর্জ্জুন স্বজন-হত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বলিলেন, "ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বধে আমাদের কি সুখ, কি মনস্তুষ্টি হইতে পারে? তাঁহারা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, যদিও অন্যায় করেন ও আমাদের শত্রুতা করেন, রাজ্য অপহরণ করেন, সত্যভঙ্গ করেন, তাঁহাদের বধে আমাদের পাপই হইবে, সুখ হইবে না।" অর্জ্জুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছেন, নিজ সুখের জন্য বা যুধিষ্ঠিরের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রবধে নিযুক্ত হন নাই, ধর্ম্মস্থাপন, অধর্ম্মনাশ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন, ভারতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সমস্ত সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য।

কুলনাশের কথা

কিন্তু স্বীয় দুর্ব্বলতার সমর্থনে অর্জ্জুন আর এক উচ্চতর যুক্তি আবিষ্কার করিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, অতএব এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নহে, অধর্ম্মযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায়

মিত্রদ্রোহ, অর্থাৎ যাঁহারা স্বভাবতঃ অনুকূল ও সহায়, তাঁহাদের অনিষ্ট করা হয়, উপরন্তু স্বীয় কুল অর্থাৎ যে কুরুনামক ক্ষত্রিয়বংশ ও জাতিতে উভয় পক্ষের জন্ম হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধিত হয়। প্রাচীন কালে জাতি প্রায়ই রক্তের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক মহান কুল বিস্তার পাইয়া জাতিতে পরিণত হইত, যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি ভারত-জাতির অন্তর্গত কুল-বিশেষ এক একটি বলশালী জাতি হইয়াছিল। কুলের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ও পরস্পরের অনিষ্টকরণ তাহাকেই অর্জ্জুন মিত্রদ্রোহ নামে অভিহিত করিলেন। একে এই মিত্রদ্রোহ নৈতিক হিসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে এই মহান দোষ মিত্রদ্রোহে সন্নিবিষ্ট যে কুলক্ষয় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। সনাতন কুলধর্ম্মের সম্যক পালন কুলের উন্নতির ও অবস্থিতির কারণ, যে মহৎ আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা গার্হস্থ্য জীবনে ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষগণ স্থাপিত ও রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, সেই আদর্শের হানি বা শৃঙ্খলার শিথিলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন হয়। কুল যতদিন সৌভাগ্যবান ও বলশালী হইয়া থাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, কুল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তমোভাবের প্রসারণে মহান ধর্ম্মে শিথিলতা হয়, তাহার ফলে অরাজকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট হয়, কুলের মহিলাগণ দুশ্চরিত্র হয় এবং কুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়, নীচজাতীয় ও নীচচরিত্রবিশিষ্ট লোকের ঔরসে মহান কুলে পুত্রোৎপাদন হয়। তাহাতে পিতৃপুরুষের প্রকৃত সন্ততিচ্ছেদে কুল-

হন্তাদের নরক প্রাপ্তি হয় এবং অধর্ম্মের প্রসারে, বর্ণ সঙ্কর-সম্ভূত নৈতিক অধোগতি ও নীচ গুণের বিস্তারে এবং অরাজকতা প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং নরকপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উভয়ই কুলনাশে নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত কুলসমষ্টিতে যে মহান জাতি হয়, সেই জাতির পুরুষপরম্পরায় আগত সনাতন আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা। তাহার পরে অর্জ্জুন আবার তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্ত্তব্য-কর্ম্মবিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া যুদ্ধের সময়েই গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। কবি এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে শোকে তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রাট হইয়াছিল বলিয়া অর্জ্জুন এইরূপ ক্ষত্রিয়ের অনুচিত অনার্য্য আচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা

আমরা অর্জ্জুনের কুলনাশবিষয়ক কথার মধ্যে একটি অতি বৃহৎ ও উন্নত ভাবের ছায়া দেখিতে পাই, এই ভাবের সহিত যে গুরুতর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, তাহার আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্ত্তার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। অথচ আমরা যদি কেবল গীতার আধ্যাত্মিক অর্থ অন্বেষণ করি, আমাদের জাতীয়, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্ম্ম ও আদর্শ হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করি, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নের মহত্ব ও প্রয়ো-

জনীয়তা অস্বীকার করিব এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপী বিস্তার সঙ্কুচিত করিব। শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপরাঙ্মুখ দার্শনিক অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ জ্ঞানী বা ভক্ত ছিলেন, গীতায় তাঁহাদের আবশ্যকীয় জ্ঞান ও ভাব খুঁজিয়া যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যাঁহারা এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী তাঁহারাই গীতার গূঢ়তম শিক্ষার অধিকারী। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কর্ম্মী ছিলেন, গীতার পাত্র অর্জ্জুন ভক্ত ও কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটী মহৎ রাজনীতিক সংঘর্ষ গীতাপ্রচারের কারণ, সেই সংঘর্ষে অর্জ্জুনকে মহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র ও নিমিত্ত রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতার উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রই শিক্ষাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় রাজকুমার, রাজনীতি ও যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। গীতার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া, গীতার বক্তা, পাত্র ও প্রচারের কারণ বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করা চলিবে কেন?

মানব সংসারের পাঁচটী মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিরকাল বর্ত্তমান—ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, জাতি, মানবসমষ্টি। এই পাঁচটী প্রতিষ্ঠার উপর ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবৎপ্রাপ্তির দুই মার্গ, বিদ্যাকে আয়ত্ত করা এবং অবিদ্যাকে আয়ত্ত করা, দুইটীই আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্দর্শনের উপায়। বিদ্যার মার্গ ব্রহ্মের

অভিব্যক্তি অবিদ্যাময় প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ লাভ বা পরব্রহ্মে লয়। অবিদ্যার মার্গ সর্ব্বত্র আত্মা ও ভগবানকে দর্শন করিয়া জ্ঞানময় মঙ্গলময় শক্তিময় পরমেশ্বরকে বন্ধু, প্রভু, গুরু, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, দাস, প্রেমিক, পতি, পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়া। শান্তি বিদ্যার উদ্দেশ্য, প্রেম অবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবানের প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী। আমরা যদি কেবল বিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি বিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব, যদি কেবল অবিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটীকেই যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই সম্পূর্ণ-ভাবে বাসুদেবকে লাভ করেন; তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। যাঁহারা বিদ্যার শেষ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। ঈশা উপনিষদে এই মহান সত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়ান্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

"যাঁহারা অবিদ্যা উপাসক হন, তাঁহারা অন্ধ অজ্ঞানরূপ তমঃ মধ্যে প্রবেশ করেন। যে ধীর জ্ঞানীগণ আমাদিগের নিকট

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যারও ফল আছে, সেই দুই ফল স্বতন্ত্র। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতময় পুরুষোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন।"

সমস্ত মানবজাতি অবিদ্যা ভোগ করিয়া বিদ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাশ। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সাধক, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মযোগী, তাঁহারা এই মহৎ অভিযানের অগ্রগামী সৈন্য, দূর গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌছিয়া ফিরিয়া আসেন ও মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্রবণ করান, পথপ্রদর্শন করেন, শক্তি বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি আসিয়া পথ সুগম করেন, অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন, বাধা বিনাশ করেন। অবিদ্যায় বিদ্যা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে সন্ন্যাস, আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগৎ, জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জ্ঞান, ইহাই মানবজাতির গন্তব্যস্থানে গমনের নির্দ্দিষ্ট পথ। আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেহাত্মক বোধ, স্বার্থবোধ, সেই সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ, অতএব পরকে আত্মবৎ দেখা উন্নতির প্রথম সোপান। মনুষ্য প্রথম ব্যক্তি লইয়া থাকে, নিজ ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ভোগ ও শক্তি বিকাশে রত থাকে। আমি দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, সুখ, সৌন্দর্য্য, মনের ক্ষিপ্রতা, আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফুল্লতা

জীবনের উদ্দেশ্য ও উন্নতির চরমাবস্থা, মনুষ্যের এই প্রথম বা আসুরিক জ্ঞান। ইহারও প্রয়োজন আছে, দেহ, মন, প্রাণের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন করিয়া তাহার পর সেই পূর্ণবিকশিত শক্তি পরের সেবায় প্রয়োগ করা উচিত। সেই জন্য আসুরিক শক্তিবিকাশ মানবজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থা, পশু, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ পর্য্যন্ত মনুষ্যের মনে, কর্ম্মে, চরিত্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজ্ঞান বিস্তার করিয়া পরকে আত্মবৎ দেখিতে আরম্ভ করে, পরার্থে স্বার্থ ডুবাইতে শিখে। প্রথম পরিবারকেই আত্মবৎ দেখে, স্ত্রী-সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, স্ত্রীসন্তানের সুখের জন্য নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে বংশ বা কুলকে আত্মবৎ দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী-সন্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের ও স্ত্রীসন্তানদের সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে জাতিকে আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী-সন্তানকে কুলকে বলি দেয়,—যেমন চিতোরের রাজপুতকুল সমস্ত রাজপুত জাতির রক্ষার্থে বার বার স্বেচ্ছায় বলি হইল,—জাতির সুখ, গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের সুখ, গৌরব বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে সমস্ত মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে, মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে, কুলকে, জাতিকে বলি দেয়,—মানবজাতির সুখ ও উন্নতির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের, জাতির

সুখ, গৌরববৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। এইরূপ পরকে আত্মবৎ দেখা, পরের জন্য নিজেকে ও নিজের সুখকে বলি দেওয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। য়ুরোপের নৈতিক উন্নতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপীয়গণ ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে ডুবাইতে শিখিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপীয়গণ কুলকে জাতিতে ডুবাইতে শিখিয়াছেন, জাতিকে মানবসমষ্টিতে ডুবান এখন তাঁহাদের মধ্যে কঠিন আদর্শ বলিয়া প্রচারিত; টলষ্টয় ইত্যাদি মনীষীগণ এবং সোশ্যালিষ্ট, এনার্কিষ্ট ইত্যাদি নব আদর্শের অনুমোদক দল এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত য়ুরোপের দৌড়। তাঁহারা অবিদ্যার উপাসক, প্রকৃত বিদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।

ভারতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মনীষীগণ আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন অবিদ্যার পঞ্চপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ভগবান আছেন, তাঁহাকে না জানিতে পারিলে অবিদ্যাও জ্ঞাত হয় না, আয়ত্ত হয় না; অতএব কেবল পরকে আত্মবৎ না দেখিয়া, আত্মবৎ পরদেহেষু অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ করিব, নিজের উৎকর্ষে পরিবারের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; পরিবারের উৎকর্ষ করিব, পরিবারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; জাতির উৎকর্ষ করিব, জাতির উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই জ্ঞান আর্য্য সামাজিক ব্যবস্থার ও আর্য্য শিক্ষার মূলে নিহিত। ব্যক্তি-

গত ত্যাগ আর্য্যের মজ্জাগত অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানবজাতির জন্য ত্যাগ, ভগবানের জন্য ত্যাগ। আমাদের শিক্ষায় যে দোষ বা ন্যূনতা লক্ষিত হয়, সেই দোষ কয়েকটী ঐতিহাসিক কারণের ফল; যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে দেখি, সমাজের হিতে ব্যক্তির ও পরিবারের হিত ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির রাজনীতিক জীবন বিকাশ আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বলিয়া গৃহীত ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল। অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, রাজপুতানার ইতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের স্বদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিদ্যা উপাসনায়, অবিদ্যাভয়ে আমরা সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পারি নাই, সেই দোষে তমোভিভূত হইয়া জাতিধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে দুঃখে অজ্ঞানে পড়িলাম, অবিদ্যাও আয়ত্ত করিতে পারি নাই, বিদ্যাও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য

কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিন্ন হয়, প্রাচীনকালে সেই ভিন্নতা ভারতে ও অন্য দেশেও এত পরিস্ফুট হয় নাই। কয়েকটী বড় বড় কুলের সমাবেশে একটী জাতি হইয়া দাঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক পূর্ব্বপুরুষের

বংশধর, নয় ভিন্ন বংশজাত হইলেও প্রীতি সংস্থাপনে এক বংশজাত বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি হয় নাই, কিন্তু যে বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ করিত, তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, এক ধর্ম্ম, এক সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। তথাপি প্রাচীন-কাল হইতে একত্বের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কুরু, কখনও পাঞ্চাল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা বা সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া সাম্রাজ্য করিত, কিন্তু প্রাচীন কুলধর্ম্ম ও কুলের স্বাধীনতাপ্রিয়তা একত্বের এমন প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত যে সেই চেষ্টা কখন চিরকাল টিকিতে পারে নাই। ভারতে এই একত্বের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্যের চেষ্টা পুণ্যকর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল যে চেদিরাজ শিশুপালের ন্যায় তেজস্বী ও দুরন্ত ক্ষত্রিয়ও যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য স্থাপনে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এইরূপ একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্ব্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের প্রধান বাধা গর্ব্বিত ও তেজস্বী কুরুবংশ। কুরুজাতি অনেক দিন হইতে ভারতের নেতৃস্থানীয় জাতি ছিল—ইংরাজীতে যাহাকে Hegemony বলে

অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব—তাহাতে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল। যতদিন এই জাতির বল ও গর্ব্ব অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত্ব স্থাপিত হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব তিনি কুরুজাতির ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বিস্মৃত হন নাই; যাহা ধর্ম্মতঃ কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত করা অধর্ম্ম বলিয়া কুরুজাতির যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই যুধিষ্ঠিরকে ভাবী সম্রাটপদে নিযুক্ত করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধার্ম্মিক, সমর্থ হইয়াও স্নেহের বশে নিজের প্রিয় যাদবকুলকে কুরুজাতির স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা করিয়া নিজ প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু কেবল বয়স বা পূর্ব্ব অধিকার দেখিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়, গুণ ও সামর্থ্যও দেখিতে হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যদি অধার্ম্মিক, অত্যাচারী বা অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাত্রকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেন। যুধিষ্ঠির যেমন বংশক্রমে, ন্যায্য অধিকারে ও দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মে সম্রাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রতিভাবান অনেক বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, কিন্তু কেবল বলে ও প্রতিভায় কেহ রাজ্যের অধিকারী হন

না। রাজা ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, প্রকৃতিরঞ্জন করিবেন, দেশ রক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্ম্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্ম্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতা ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জ্জুন পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের তুল্য পরাক্রমী রাজা বা বীরপুরুষ সমকালীন ভারতে ছিল না। অতএব জরাসন্ধবধে কণ্টক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক ও রাজনীতিবিদ্। দেশের ধর্ম্ম, দেশের প্রণালী, দেশের সামাজিক নিয়মের ভিতরে কর্ম্ম করিয়া যদি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্ম্মের হানি, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন? বিনা কারণে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব করা দেশের অহিতকর হয়। সেইহেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালী রক্ষা করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু, দেশের প্রাচীন প্রণালীর এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও সে ফল স্থায়ী হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা ছিল। যাঁহার সামরিক বলবৃদ্ধি আছে, তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামাত্র সেই মুকুট মস্তক হইতে আপনি খসিয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাতিসকল তাঁহার পিতার

বা পিতামহের বশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিজয়ীর পুত্রের বা পৌত্রের অধীনতা স্বীকার করিবেন কেন? বংশগত অধিকার নহে, রাজসূয় যজ্ঞই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীর্য্য সেই সাম্রাজ্যের মূল, যাঁহার অধিক বলবীর্য্য তিনিই যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইবেন। অতএব সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব হইবার কোন আশা ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা Hegemonyই হইতে পারে। এই প্রথার আর একটী দোষ এই ছিল যে, নব নব সম্রাটের অকস্মাৎ বলবৃদ্ধি ও প্রধানত্বলাভে দেশের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণু তেজস্বী ক্ষত্রিয়গণের হৃদয়ে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হয়; ইনি প্রধান হইবেন কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচার সহজে মনের মধ্যে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যুধিষ্ঠিরের নিজকুলের ক্ষত্রিয়গণ এই ঈর্ষ্যায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহার পিতৃব্যের সন্তানগণ এই ঈর্ষার উপর নির্ভর করিয়া কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। দোষের প্রণালীর দোষ অল্পদিনেই ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্ম্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ্। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি তাঁহার যুগের প্রধান বিপ্লবকারী। রাজা ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিবার সময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক ভারতবাসীর আক্রোশ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচালিত যাদবকুল কখনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা ধর্ম্মকে বিকৃত করিতে কুণ্ঠিত হন না, যে কৃষ্ণের পরামর্শে কার্য্য করিবে, সে নিশ্চয়ই অবিলম্বে

পাপে পতিত হইবে। কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত রক্ষণশীলের মতে নূতন প্রয়াসই পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পতনে বুঝিলেন—বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পূর্ব্বে জানিতেন, —যে, দ্বাপরযুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও রক্ষণীয় নহে। অতএব তিনি আর সেইরূপ চেষ্টা করিলেন না, কলির উচিত ভেদদণ্ডপ্রধান রাজনীতি অনুসরণ করিয়া গর্ব্বিত দৃপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির বল নাশে ভাবী সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদের পুরাতন সমকক্ষ শত্রু পাঞ্চাল-জাতিকে কুরুধ্বংসে প্রবৃত্ত করিলেন, যত জাতি কুরুদের বিদ্বেষে যুধিষ্ঠিরের প্রেমে বা ধর্ম্মরাজ্য ও একত্বের আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ করিলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করাইলেন। যে সন্ধির চেষ্টা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পারে না, তথাপি ধর্ম্মের খাতিরে ও রাজনীতির খাতিরে তিনি সন্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বিজেতা দিব্যশক্তি-প্রণোদিত মহারথী অর্জ্জুন। অর্জ্জুন শস্ত্রত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক পরিশ্রম পণ্ড হইত, ভারতের একত্ব সাধিত হইত না, দেশের ভবিষ্যতে অবিলম্বে ঘোর কুফল ফলিত।

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ

অর্জ্জুনের সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রযোজিত, জাতির হিতচিন্তা স্নেহবশে তাঁহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। তিনি কুরুবংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হিত বিস্মৃত হইয়াছেন, অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধ মহাপাপ এ কথা সকলে জানে কিন্তু ভ্রাতৃ-প্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহায় হওয়া, জাতীয় হিত-সাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ গুরুতর। অর্জ্জুন যদি শস্ত্রত্যাগ করেন, অধর্ম্মের জয় হইবে, দুর্য্যোধন ভারতে প্রধান নৃপতি ও সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চরিত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ স্বীয় কুদৃষ্টান্তে কলুষিত করিবেন, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুল সকল স্বার্থ, ঈর্ষা, ও বিরোধপ্রিয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে, দেশকে একত্রিত নিয়ন্ত্রিত ও শক্তির সমাবেশে সুরক্ষিত করিবার কোন অসপত্ন ধর্ম্মপ্রণোদিত রাজশক্তি থাকিবে না, এই অবস্থায় যে বিদেশী আক্রমণ তখনও রুদ্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভারতের উপর পড়িয়া প্লাবিত করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, সে অসময়ে আসিয়া আর্য্য সভ্যতা ধ্বংস করিয়া জগতে ভাবী হিতের আশা নির্ম্মূল করিত। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাশে দুই সহস্র বর্ষ পরে ভারতে যে রাজনীতিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তখনই আরম্ভ হইত।

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ

লোকে বলে অর্জ্জুন যে অনিষ্টের ভয়ে এই আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্য সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই অনিষ্ট ফলিল। ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কলি প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ। এই যুদ্ধে ভীষণ ভ্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্ঞাস্য এই, আর কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইত? এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনার বিফলতা জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেন, সেইটুকু পদ রাখিবার স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃঢ় নিশ্চয় ছিল, বিনাযুদ্ধে সূচ্যাগ্র ভূমিও দিবেন না। যখন সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে ভ্রাতৃবধ হইবে বলিয়া মহৎ কর্ম্মে ক্ষান্ত হওয়ায় অধর্ম্ম হয়। পরিবারের হিত জাতির হিতে, জগতের হিতে ডুবাইতে হয়; ভ্রাতৃস্নেহে, পারিবারিক ভালবাসার মোহে কোটী কোটী লোকের সর্ব্বনাশ করা চলে না, কোটি কোটি লোকের ভাবী সুখ বা দুঃখমোচন বিনষ্ট করা চলে না, তাহাতেও ব্যক্তির ও কুলের নরকপ্রাপ্তি হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরুবংশে ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছে। যেমন পারিবারিক ভালবাসার মায়া আছে, তেমনই কুলের উপর মায়া

আছে। দেশভাইকে কিছু বলিব না, দেশবাসীর সঙ্গে বিরোধ করিব না, অনিষ্ট করিলেও আততায়ী হইলেও, দেশের সর্ব্বনাশ করিলেও তিনি ভাই, স্নেহের পাত্র, নীরবে সহ্য করিব, আমাদের মধ্যে যে বৈষ্ণবী-মায়া প্রসূত অধর্ম্ম ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অনেকের বুদ্ধিভ্রংশ করে, তাহা এই কুলের মায়ার মোহে উৎপন্ন। বিনা কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যকতার অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্ম্ম। কিন্তু যে দেশভাই সকলের মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তাহার অনিষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করিয়া সেই মাতৃহত্যা বা অনিষ্টাচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া আরও গুরুতর পাতক। শিবাজী যখন মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা! কি কর, ইঁহারা দেশ-ভাই, নীরবে সহ্য কর, মোগল মহারাষ্ট্রদেশকে অধিকার করে করুক, মারাঠায় মারাঠায় প্রেম থাকিলেই হয়, কথাটী কি নিতান্ত হাস্যকর বোধ হইত না? আমেরিকানেরা যখন দাসত্বপ্রথা উঠাই-বার জন্য দেশে বিরোধসৃষ্টি ও অন্তঃস্থ যুদ্ধ সৃষ্টি করিয়া সহস্র সহস্র দেশভাইয়ের প্রাণসংহার করিলেন, তাঁহারা কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন? এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশ-ভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়। ইহাতে কুলনাশের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না। অবশ্য যদি সেই কুলের রক্ষা জাতির হিতের জন্য আবশ্যক হয়, সমস্যা জটিল

হয়। মহাভারতের যুগে ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে কুলকেই মনুষ্যজাতির কেন্দ্র বলিয়া জানিত। সেই জন্যই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা পুরাতন বিদ্যার আকর ছিলেন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্ম পাণ্ডবদের দিকে, জানিতেন যে মহৎ সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সমস্ত ভারতকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে কুলই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও জাতির কেন্দ্র, কুলনাশে ধর্ম্মরক্ষা ও জাতিসংস্থাপন অসম্ভব। অর্জ্জুনও সেই ভ্রমে পতিত হইলেন। এই যুগে জাতিই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতি রক্ষা এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম, জাতি নাশ এই যুগের অমার্জ্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয় ত জগতের বড় বড় জ্ঞানী ও কর্ম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিতসাধন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল

প্রথম কৃপার আবেশে অর্জ্জুন কুলনাশের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন, কেন না এই বৃহৎ সৈন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, জাতির চিন্তা আপনিই মনে উঠে। বলা হইয়াছে, কুলের হিত-চিন্তা সেইকালের ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন জাতির

হিতচিন্তা আধুনিক মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কুল-নাশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশঙ্কা কি অমূলক ছিল? অনেকে বলে, অর্জ্জুন যাহা ভয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মূল কারণ। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বংশের লোপে, ক্ষত্র-তেজের হ্রাসে ভারতের বিষম অমঙ্গল হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বিদেশী মহিলা, যাঁহার শ্রীচরণে অনেক হিন্দু এখন শিষ্যভাবে আনত-শির, এই বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে ক্ষত্রিয়নাশে ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করাই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ধারণা, যাঁহারা এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলেন, তাঁহারা বিষয়টী না তলাইয়া অতি নগণ্য রাজনীতিক তত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই রাজনীতিক তত্ত্ব ম্লেচ্ছ বিদ্যা, অনার্য্য চিন্তাপ্রণালী সম্ভূত। অনার্য্য-গণ আসুরিক বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া জানেন।

জাতীয় মহত্ত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, চতুর্বর্ণের চতুর্ব্বিধ তেজই সেই মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ রাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান বিনয় ও পরহিতচিন্তার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজ-রহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয়বংশের

লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্ত্তব্য। ব্রহ্মতেজপরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ দুর্দ্দান্ত উদ্দাম আসুরিক বলে পরিণত হইয়া প্রথম পরহিত বিনাশ করিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রোমান কবি যথার্থ বলিয়াছেন, অসুরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। সত্ত্ব রজঃকে সৃষ্টি করিবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা করিবে, সাত্ত্বিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব। সত্ত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্ত্বকে গ্রাস করে, তমঃপ্রাদুর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বয়ং পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে শূদ্র রাজা হইবে, ব্রাহ্মণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শূদ্রের দাস হইবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং ম্লান হইয়া ধর্ম্মের অবনতির কারণ হইবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে আসুরিক বলের প্রভাবে ক্ষণিক উত্তেজনায় শক্তিসঞ্চার ও মহত্ত্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় দুর্ব্বলতা, গ্লানি ও শক্তিক্ষয় হইয়া দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজসিক বিলাস, দম্ভ ও স্বার্থের বৃদ্ধিতে জাতি অনুপযুক্ত হইয়া মহত্ত্বরক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় অন্তর্বিরোধে, দুর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শত্রুর সহজলভ্য শিকার হয়। ভারতের ও য়ুরোপের ইতিহাসে এই সকল পরিণামের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাভারতের সময়ে আসুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থির

হইয়াছিল। ভারতে এমন তেজস্বী পরাক্রমশালী প্রচণ্ড ক্ষত্রিয়-তেজের বিস্তার পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু সেই ভীষণ বলের সদুপযোগ হইবার সম্ভাবনা অতিশয় কম ছিল। যাঁহারা এই বলের আধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসুর প্রকৃতির—অহঙ্কার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের মজ্জাগত ছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ এই বল বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে যে তিন প্রকার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার একটী না একটী নিশ্চয়ই ঘটিত। ভারত অসময়ে ম্লেচ্ছের হাতে পড়িত। মনে রাখা উচিত পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছে, আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে ম্লেচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিন্ধুনদীর অপর পার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জ্জুনপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য এতদিন ব্রহ্মতেজ-অনুপ্রাণিত ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সঞ্চিত ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে তাহার ভগ্নাংশই দুই সহস্র বর্ষ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সেইদিনই গুজরাট যুদ্ধে ও লক্ষ্মীবাইয়ের চিতায় তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক কার্য্যের সুফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, ভারতকে, জগতকে রক্ষা করিবার জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার আবার লুপ্ত ব্রহ্মতেজ জাগাইয়া গেলেন,

সেই ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজ সৃষ্টি করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্র-তেজ কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্ব্বাপিত করেন নাই, বরং আসুরিক বল বিনাশ করিয়া ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন। আসুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃশক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহা-বিপ্লব, অন্তর্বিরোধকে উৎকট ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, উদ্দাম ক্ষত্রিয়কুল সংহার সর্ব্বদা অনিষ্টকর নয়। অন্তর্বিরোধে রোমান ক্ষত্রিয়কুলনাশের ও রাজতন্ত্র স্থাপনে রোমের বিরাট সাম্রাজ্য অকাল বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে শ্বেত ও রক্ত গোলাপের অন্তর্ব্বিরোধে ক্ষত্রিয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অষ্টম হেন্‌রি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত পরাক্রম-শালী বিশ্ববিজয়ী আধুনিক ইংলণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়া-ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে রক্ষা পাইল।

কলিযুগে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্য ভগবান কখন অবতীর্ণ হন নাই। ধর্ম্মরক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার। বিশেষতঃ কলিযুগেই ভগবান পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন, তাহার কারণ, কলিতে মানুষের অবনতির অধিক ভয়, অধর্ম্মবৃদ্ধি স্বাভাবিক, অতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য, অধর্ম্মনাশ ও ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য, কলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই যুগে পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কলির রাজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছিল, তাঁহারই আবির্ভাবে ভীত হইয়া কলি

নিজের রাজ্যে পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে পরীক্ষিৎ কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়া তাঁহারই যুগে তাঁহার একাধিপত্য স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যে কলিযুগের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কলির সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নায়করূপে ভগবানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ঘন আসেন, সেই সংগ্রামের উপযোগী ব্রহ্মতেজ, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা ও রক্ষা করিতে ভগবান কলির মুখে মানব শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের রক্ষা মানবকল্যাণের ভিত্তি ও আশাস্থল। ভগবান কুরুক্ষেত্রে মানবের রক্ষা করিয়াছেন। সেই রক্তসমুদ্রে নূতন জগতের লীলাপদ্মে কালরূপী বিরাটপুরুষ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন

মধুসূদন অর্জ্জুনের কৃপার আবেশ, অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ও বিষণ্ণ-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভবান বলিলেন

"হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে এই অনার্য্যের আদৃত স্বর্গ-পথরোধক অকীর্ত্তিকর মনের মলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত?

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে পৃথাতনয়! হে শত্রুদমনে সমর্থ! ক্লীবত্ব আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই ক্ষুদ্র মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর, ওঠ।"

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জ্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার জন্ত অন্তর্য্যামী তাঁহার প্রিয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ ইহা তোমার স্বপক্ষের সঙ্কট-কাল, এখন যদি তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ বিপদ ও বিনাশের সম্ভাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের মনে উঠিবার কথা নাই, কোথা হইতে হঠাৎ এই দুর্ম্মতি ? তোমার ভাব দুর্ব্বলতাপূর্ণ, পাপ-পূর্ণ। অনার্য্যগণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, কিন্তু তাহা আর্য্যের অনুচিত, তাহাতে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্ন হয় এবং ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তির লোপ হয়। তাহার পরে আরও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিলেন। এই ভাব ক্লীবোচিত, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি কুন্তির পুত্র, তুমি এইরূপ কথা বল ? এই প্রাণের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর, ওঠ, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদ্যোগী হও।

কৃপা ও দয়া

কৃপা ও দয়া স্বতন্ত্র ভাব, এমন কি কৃপা দয়ার বিরোধী ভাবও হইতে পারে। আমরা দয়ার বশে জগতের কল্যাণ

করি, মানুষের দুঃখ, জাতির দুঃখ, পরের দুঃখ মোচন করি। যদি নিজের দুঃখ বা ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ সহ্য না করিতে পারিয়া সেই কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার দয়া নাই, কৃপারই আবেশ হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির বা দেশের দুঃখ মোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার। রক্তপাতের ভয়ে, প্রাণীহিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্য্যে বিরত হইলাম, জগতের, জাতির দুঃখের চিরস্থায়িতায় সায় দিলাম, এই ভাব কৃপার। লোকের দুঃখে দুঃখী হইয়া যে দুঃখমোচনের প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পরের দুঃখচিন্তায় বা দুঃখদর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম্ম, কৃপা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া জগতের দুঃখমোচন করিতে নির্গত হইলেন। তীব্র দয়ার আবেশে উন্মত্ত কালী জগতময় অসুর সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্তপ্লাবিত করিয়া সকলের দুঃখমোচন করিলেন। অর্জ্জুন কৃপার আবেশে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই ভাব অনার্য্য-প্রশংসিত, অনার্য্য-আচরিত। আর্য্যশিক্ষা উদার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা। অনার্য্য মোহে পড়িয়া অনুদার ভাবকে ধর্ম্ম বলিয়া উদার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অনার্য্য রাজসিকভাবে ভাবান্বিত হইয়া নিজের, প্রিয়জনের, নিজ পরিবার বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, কৃপায় ধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গর্ব্ব করে, কঠোরব্রতী

আর্য্যকে নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক বলে। অনার্য্য তামসিক মোহে মুগ্ধ হইয়া অপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিয়তাকে ধর্ম্মনীতির উর্দ্ধতম আসন প্রদান করে। দয়া আর্য্যের ভাব। কৃপা অনার্য্যের ভাব।

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও দুঃখকে বিনাশ করিবার জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়ার বশে পরের দুঃখলাঘবের জন্য শুশ্রূষায় যত্নে ও পরহিত-চেষ্টায় সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিয়া দেয়। যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্ত্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান—সে ক্লীব। এই ভাব ক্ষুদ্র, এই ভাব দুর্ব্বলতা। বিষাদ কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে বিষাদকে আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় দেয়। এই চিত্তমলিনতা, এই অশুদ্ধ ও দুর্ব্বলভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হইয়া কর্ত্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, ধর্ম্মের রক্ষা, পৃথিবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মর্ম্ম।

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন বলিলেন

"হে মধুসূদন, হে শত্রু নাশকারী, আমি কিরূপে ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীয় গুরুজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

এই উদারচেতা গুরুজনকে বধ না করিয়া পৃথিবীতে ভিখারীর অবস্থা ভোগ করা শ্রেয়ঃ। গুরুজনকে যদি বধ করি, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হারাইয়া কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও রুধিরাক্ত বিষয়-ভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোনটী অধিক প্রার্থনীয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাদিগকে বধ করিলে আমাদের জীবিত থাকিবার কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তাঁহারাই বিপক্ষীয় সৈন্যের অগ্রভাগে উপস্থিত, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সৈন্যনায়ক।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি বিমূঢ়, সেইজন্য তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, তুমি আমাকে কিসেতে শ্রেয়ঃ হইবে নিশ্চিত ভাবে তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ লইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

কেন না, পৃথিবীতে অসপত্ন রাজ্য এবং দেবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিলেও এই শোক আমার সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ শোষণ করিয়া লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি দেখি না।"

অর্জ্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উদ্দেশ্য অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাজনৈতিক আপত্তি উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর যে কে

আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষার্থে শরণাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্বীকার করি, আমি ক্ষত্রিয়, কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া মহৎ কার্য্যে বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্লীবত্বসূচক, অকীর্ত্তিজনক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু মনও মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা মহাপাপ, নিজ সুখের জন্য গুরুজনকে হত্যা করিলে অধর্ম্মে পতিত হইয়া ধর্ম্ম, মোক্ষ, পরলোক, যাহা বাঞ্ছনীয়, সকলই যাইবে। কামনা তৃপ্ত হইবে, অর্থ স্পৃহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু সে কয়দিন। অধর্ম্মলব্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহার পর অনির্ব্বচনীয় দুর্গতি হয়। আর যখন ভোগ করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে গুরুজনের রক্তের আস্বাদ পাইয়া কি সুখ বা শান্তি হইবে? প্রাণ বলে, ইহারা আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা করিলে আমি আর এই জন্মে সুখভোগ করিতে পারিব না, বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যভোগ দাও বা স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যভোগ দাও, আমি কিন্তু শুনিব না। যে শোক আমাকে অভিভূত করিবে, তাহা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে শিথিল ও অসমর্থ হইবে, তখন তুমি কি ভোগ করিবে? আমার বিষম চিত্তের দীনতা উপস্থিত, মহান ক্ষত্রিয় স্বভাব সেই দীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার নিকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান, শক্তি, শ্রদ্ধা দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের

পন্থা। ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত ভার শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত যোগের অধিকারী। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি যদি গুরু-হত্যাও করিতে বল, ইহাকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া দাও, আমি তাহাই করিব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অর্জ্জুন সমসাময়িক সকল মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জ্জুনের দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাহার পরে গুরুর ভার গ্রহণ করিয়া আসল জ্ঞান দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত আপত্তি খণ্ডন, তাহার পরে গীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তি খণ্ডনের মধ্যে কয়েকটী অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহা না বুঝিলে গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কয়েকটী কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় বলিলেন

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষিকেশকে এই কথা বলিয়া আবার সেই গোবিন্দকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এবং নীরব হইয়া রহিলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ হাস্য করিয়া দুই সেনার মধ্যস্থলে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এই উত্তর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন

"যাহাদের জন্য শোক করার কোনও কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্ত্বকথা লইয়া বাদবিবাদ করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ইহাও নহে যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিবৃন্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহ-ত্যাগের পরে আর থাকিব না।

গীতার ভূমিকা

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

যেমন এই জীব-অধিষ্ঠিত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কালের গতিতে হয়, তেমনই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী বিমূঢ় হয় হয় না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সংস্কার সৃষ্ট হয়, সেই স্পর্শ সকল অনিত্য, আসে, যায়, সেই সকল অবিচলিত হইয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

যে স্থিরবুদ্ধি পুরুষ এই স্পর্শ সকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত হন না, তৎসৃষ্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম হন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব হয় না, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না, তথাপি সৎ ও অসৎ দুইটীর অন্ত হয়, ইহা তত্ত্বদর্শীগণ দর্শন করিয়াছেন।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥

কিন্তু যাহা এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার করিয়াছেন, সেই আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধ্বংস করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮॥

নিত্য দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহের অন্ত আছে, আত্মা অসীম ও অনশ্বর; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥

যিনি আত্মাকে হন্তা বলেন এবং যিনি দেহনাশে আত্মাকে নিহত বলিয়া বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্যাও করে না, হতও হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উদ্ভব হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না। সে জন্ম রহিত, নিত্য, সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হয় না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

যিনি ইহাকে নিত্য অনশ্বর ও অক্ষয় বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কিরূপে কাহাকে হত্যা করেন বা করান?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণিবিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ফেলিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপেই জীব জীর্ণ দেহ ফেলিয়া অন্য নূতন দেহকে আশ্রয় করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। ॥ ২৪ ॥

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকার রহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক করা পরিত্যাগ কর।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

আর তুমি যদি মনে কর জীব বার বার জন্মায় ও মরে, তাহা হইলেও তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য্য পরিণাম, তাহার জন্য শোক করা অনুচিত।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়া থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হয়, এই স্বাভাবিক ক্রমে শোক করিবার কোনও কারণ নাই।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে পারেন নাই।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, অতএব এই সকল প্রাণীর জন্য কখন শোক করা উচিত নহে।"

মৃত্যুর অসত্যতা

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ হইল, সেই হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ—অর্জ্জুনের ভ্রমে মানবজাতির পুরাতন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্য্যামী হাসিলেন—সেই ভ্রম শ্রীকৃষ্ণেরই মায়াপ্রসূত, জগতে অশুভ, দুঃখ ও দুর্ব্বলতা ভোগ ও সংযম দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য তিনি মানবকে এই মায়ায় বশীভূত করিয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, সুখঃদুঃখের অধীনত্ব, ও প্রিয় অপ্রিয় বোধ ইত্যাদি অজ্ঞান অর্জ্জুনের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে দূর করিয়া জগৎকে অশুভ-মুক্ত করিতে হইবে, সেই শুভ কার্য্যের অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত

করিবার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, গীতা প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু প্রথম অর্জ্জুনের মনে যে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তাঁহাকেই গীতা প্রদর্শিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র; কিন্তু মানবজাতি এখনও গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অর্জ্জুনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও কাতরতা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কলিযুগে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া আসিতেছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম দয়া আনয়ন করিয়া, ইসলামধর্ম্ম শক্তি আনয়ন করিয়া সেই দুঃখভোগ লাঘব করিতে আসিয়াছে। আজ কলিযুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির বংশধরগণকে গীতা প্রদান করিতেছেন, যদি গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সুনিশ্চিত ফল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় পাপপুণ্য বিচার করিতেছ, জীবন মরণের তত্ত্ব বলিতেছ, জাতির কল্যাণ অকল্যাণ কিসেতে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞান পূর্ণ। স্পষ্টকথা বল, আমার হৃদয় দুর্ব্বল, শোকে কাতর, বুদ্ধি কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ; জ্ঞানীর ভাষায় অজ্ঞের ন্যায় তর্ক করিয়া তোমার

দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শোক মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যমাত্রেরই মরণ ও বিচ্ছেদ অতি ভয়ঙ্কর, জীবন মহামূল্য, শোক অসহ্য, কর্ত্তব্য কঠোর, স্বার্থসিদ্ধি মধুর বুঝিয়া হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাঁদে, কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে কেহ জ্ঞানপ্রসূত বলে না। যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক করেন না—না মৃত ব্যক্তির জন্য, না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তিনি এই কথা জানেন—মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা চিরকাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান, জীবনের মরণের সঙ্গে এই পৃথিবীতে লুকোচুরি খেলা করিতে আসিয়াছি—প্রকৃতির বিশাল নাট্যগৃহে হাসিকান্নার অভিনয় করিতেছি, শত্রু মিত্র সাজিয়া যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন করিতেছি। এই যে অল্পকাল বাঁচিয়া থাকি, কাল পরশ্ব দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানিনা, ইহা আমাদের অনন্তক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র, ক্ষণিক খেলা, কয়েকক্ষণের ভাব। আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকিব—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর—প্রকৃতির ঈশ্বর আমরা, জীবন মরণের কর্ত্তা, ভগবানের অংশ, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকারী। যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, জরা, তেমনই দেহান্তর প্রাপ্তি,—মরণ নাম মাত্র, নাম শুনিয়া আমরা ভয় পাই, দুঃখিত হই, বস্তুতঃ যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না,

দুঃখিতও হইতাম না। আমরা যদি বালকের যৌবনপ্রাপ্তিকে মরণ বলিয়া কাঁদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক কোথায় গেল, এই যুবাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনার-চাঁদ কোথায় গিয়াছে—আমাদের ব্যবহারকে সকলে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিত; কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, বালকদেহে ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। জ্ঞানী, সাধারণ মানুষের মরণে ভয় ও মরণে দুঃখ দেখিয়া তাহার ব্যবহার ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিয়া দেখে, কেননা, দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে একই পুরুষ বাহ্য পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। অমৃতের সন্তান আমরা, কে মরে, কে মারে? মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না—মৃত্যু ফাঁকা আওয়াজ, মৃত্যু ভ্রম, মৃত্যু নাই।

মাত্রা

পুরুষ অমর প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল পুরুষ অবস্থিত। প্রকৃতিস্থ পুরুষ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ করিবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। আমরা দেখি রূপ, শুনি শব্দ, আঘ্রাণ করি গন্ধ, আস্বাদ করি রস, অনুভব করি স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই সমস্ত তন্মাত্রই ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিশেষ বিষয় সংস্কার। বুদ্ধির বিষয় চিন্তা। পঞ্চ তন্মাত্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবার জন্য পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর সম্ভোগ ও অনন্ত ক্রীড়া। এই ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখ দুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ দুঃখ আছে, শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসা, হর্ষশোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমাত্রই অশুদ্ধ, যে নিষ্কাম, সে শুদ্ধ। কামনায় রাগ ও দ্বেষ সৃষ্ট হয়, রাগদ্বেষের বশে পুরুষ বিষয় আসক্ত হয়, আসক্তির ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ, এমন কি ব্যথিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হইয়াও আসক্তির অভ্যাসদোষে তাহার ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণার কারণ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়।

সমভাব

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আত্মার নিত্যতার উল্লেখ করিয়া পরে অজ্ঞানের বন্ধন শিথিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মাত্রা অর্থাৎ বিষয়ের নানারূপ স্পর্শ সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের কারণ। এই স্পর্শ সকল অনিত্য, তাহাদের আরম্ভও আছে, অন্তও আছে, অনিত্য বলিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য বস্তুতে যদি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হৃষ্ট হই, তাহার নাশে বা অভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান

বলে। অজ্ঞানে অনশ্বর আত্মার সনাতন ভাব ও অব্যয় আনন্দ আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্তুতে মত্ত হইয়া থাকি, তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এইরূপ অভিভূত না হইয়া যে বিষয়ের স্পর্শ সকল সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিয়াও সুখ দুঃখে শীতোষ্ণ, প্রিয়াপ্রিয়ে, মঙ্গলামঙ্গলে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ ও শোক অনুভব না করিয়া সমানভাবে প্রফুল্লচিত্তে হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুষ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, অজ্ঞানের বন্ধন কাটিয়া সনাতন ভাব ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়,—অমৃতত্বায় কল্পতে।

সমতার গুণ

এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা। সমতাই গীতোক্ত সাধনের প্রতিষ্ঠা। গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় ভারত হইতে এই সমতার শিক্ষা লাভ করিয়া য়ুরোপে সমতাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত শিক্ষার আর একদিক ধরিয়া শান্তভোগের শিক্ষা Epicureanism বা ভোগবাদ প্রচার করিলেন। এই দুই মত, সমতাবাদ ও ভোগবাদ প্রাচীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নৈতিক মত বলিয়া জ্ঞাত ছিল এবং আধুনিক য়ুরোপেও নব আকার ধারণ করিয়া Puritanism ও Paganismএর চির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ কার্য্য। সমতায়

আসক্তি মরে, রাগদ্বেষ প্রশমিত হয়, আসক্তি নাশে এবং রাগ-দ্বেষ-প্রশমণে শুদ্ধতা জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও আসক্তি রহিত, অতএব শুদ্ধ। ইহাতেই সমতার গুণ যে সমতার সহিত আসক্তি ও রাগদ্বেষ এক আধারে থাকিতে পারে না। সমতাই শুদ্ধির বীজ।

দুঃখ জয়

গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভুল করিলেন যে তাঁহারা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুঃখ নিগ্রহ করিয়া, ছাপাইয়া, পদে দলিত করিয়া দুঃখজয়ের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গীতায় অন্যত্র বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভূতসকল নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, নিগ্রহে কি হইবে? দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, প্রেমশূন্য হইয়া যায়। দুঃখে অশ্রুজল মোচন করিব না, যন্ত্রণাবোধ স্বীকার করিব না, "এ কিছু নহে" বলিয়া নীরবে সহ্য করিব, স্ত্রীর দুঃখ, সন্তানের দুঃখ, বন্ধুর দুঃখ, জাতির দুঃখ অবিচলিত চিত্তে দেখিব, এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা তাহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে, শেষ বা চরম শিক্ষা নহে। দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় জ্ঞান, শান্তি, সমতা। শান্তভাবে সুখ দুঃখ গ্রহণ করাই প্রকৃত পথ।

প্রাণে সুখ দুঃখের সঞ্চার বারণ করিব না, বুদ্ধি অবিচলিত করিয়া রাখিব। সমতার স্থান বুদ্ধি, চিত্ত নহে, প্রাণ নহে। বুদ্ধি সম হইলে, চিত্ত ও প্রাণ আপনিই সম হয়, অথচ প্রেম ইত্যাদি প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি শুকাইয়া যায় না, মানুষ পাথর হয় না, জড় ও অসাড় হয় না। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—প্রেম ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রকৃতির চিরন্তন প্রবৃত্তি, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় পরব্রহ্মে লয়। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতিবর্জ্জন অসম্ভব। যদি কোমলতা পরিত্যাগ করি, কঠোরতা হৃদয়কে অভিভূত করিবে—যদি বাহিরে দুঃখের স্পন্দন নিষেধ করি, দুঃখ ভিতরে জমিয়া থাকিবে এবং অলক্ষিত-ভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দিবে। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তপস্যায় শক্তি হইবে বটে কিন্তু এই জন্মে যাহা ছাপাইয়া রাখিলাম, পরজন্মে তাহা সর্ব্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসিবে।

অসম্পূর্ণ